’৭১-এর নির্যাতিত নারীদের (নির্দিষ্ট) বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা নিরূপনে সরেজমিন তথ্য-সংগ্রহ

তথ্য সংগ্রহের সময়কাল:
১৬ থেকে ২১ জুলাই, ২০০৪

তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত স্থান:
যশোর জেলাসদর ও বাঘারপাড়া থানা এবং সাতক্ষীরা জেলার সদর থানা।

উদ্দেশ্য
দৃষ্টিপাতের আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য যশোর জেলার নির্দিষ্ট তিনজন ও সাতক্ষীরা জেলার নির্দিষ্ট একজন ’৭১-এর ক্ষতিগ্রস্ত নারীর বর্তমান পারিবারিক, শারীরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসংগ্রহ। এই তথ্যের ভিত্তিতে তাদের চাহিদা নিরূপন ও স্থায়ী কোনো আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিস্তারিত তথ্য

নাম: জোলেখা খাতুন
বয়স: ৬০
বর্তমান ঠিকানা: কামালনগর, সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা বাসস্ট্যান্ড থেকে দশ টাকা রিক্সা ভাড়া কামালনগর। কামালনগর বাজার থেকে সোজা কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তার দু’ধারে কয়েক ডজন বস্তিঘর চোখে পড়ে। জোলেখা খাতুন বর্তমানে এই বস্তিতে বসবাস করছেন। বস্তির জায়গাটা সরকারি। এখানে প্রায় বারো বছর ধরে তিনি থাকেন। এর আগে কামালনগরের আরেকটি বস্তিতে ছিলেন। বর্তমানে তিনি যে ঘরটিতে থাকেন তার মাপ দশ/দশ ফিট। এই ছাপড়া ঘরে জোলেখা তার মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলে শেখ আইনুল ইসলাম ও ছয় বছরের এক নাতিকে নিয়ে দরিদ্রতার মধ্যে বাস করছেন। তিন সদস্যের রান্না-খাওয়া সব এই ঘরের মধ্যেই করতে হয়। জোলেখা খাতুনের ছয় ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করলেও অন্যান্যদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর পড়ানো আর সম্ভব হয়নি। ছেলেমেয়েরা সবাই আলাদা থাকে। ছেলেরা কেউ মুরগি বিক্রি করে, কেউ দিনমজুর, কেউ কেউ রিক্সা চালায়। তারা নিজেদের সংসার চালিয়ে মায়ের জন্য কোনো টাকা-পয়সা দিতে পারে না। জোলেখাকে নিজের খরচ নিজেকেই চালাতে হয়। তার ওপর এক ছেলে ও এক নাতিকেও ভরণপোষণ করতে হয়।
ছোট ছেলে আইনুলের মানসিক অসুস্থতা ও দরিদ্রতার কারণে তার স্ত্রী স্বামীসন্তান ছেড়ে চলে গেছে। বর্তমানে ছোটছেলে আইনুল ও নাতিকে নিয়ে জোলেখা খাতুন বস্তি ঘরে কোনো রকম মাথা গুঁজে আছেন। জোলেখা খাতুনের বয়স হয়েছে। মানুষের বাড়িতে কাজ করতে বা অন্য কোনো পরিশ্রমের কাজ করতে পারেন না। তার ভাষায় বর্তমানে তিনি মানসম্মান খুইয়ে ভিক্ষা করছেন। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে চাল, ডাল, আলু যা পান তাই রান্না করে তিন জনের খাওয়া হয়। তিনি বললেন, ‘ভিক্ষা করতে যখন তখন বের হই। বাড়িতে চাল ডাল না থাকলেই ভিক্ষার জন্য বের হতে হয়। আবার যদি মনে করি ঘরে যা আছে তা দিয়ে আজ চলে যাবে, সেদিন

ভিক্ষা করতে যাই না। অনেক দিন এমনও এসেছে যে ভিক্ষা করতে বের হয়েছি কিন্তু ভিক্ষা পাইনি বা সামান্য পেয়েছি। সেদিন তো খেয়ে না-খেয়ে থাকতে হয়। ভিক্ষা করে চাল বেশি পাই, অনেকে আলু, ডাল ও তরিতরকারিও দেয়। বাসিভাত ও তরকারিও পাই। পাঁচ-ছয় টাকাও সপ্তাহে দু'একদিন হাতে আসে, তা দিয়ে তেল লবন কিনতে হয়। কাঠের চুলায় রান্না করতে হয়, সে কারণে কাঠ, কাগজ জোগাড় করতে হয়। আমার নাতিকে বললে সে মাঝে মাঝে গাছের মরা ডালপালা, কাগজ ইত্যাদি কুড়িয়ে নিয়ে আসে।" এভাবেই অর্ধহারে অনাহারে জোলেখা খাতুনের জীবন চলছে। একদিকে পেট খালি, অন্য দিকে চিন্তা করতে হয়– যে কোনো সময় সরকারি জায়গা থেকে উচ্ছেদ হতে পারেন। তখন কোথায় যাবেন, কে তাকে দেখবে।

উল্লেখ্য '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে জোলেখা খাতুনের স্বামী শেখ আবদুল কাদের মাস্টারকে পাকিস্তানি আর্মিরা জোলেখার চোখের সামনে গুলি করে হত্যা করে। বাড়ি থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তার একটি মেয়ে হারিয়ে যায়, ওকে আর পাওয়া যায়নি। সে সময় জোলাখার সংসার ছিলো স্বচ্ছল। স্বাধীনের পর সুযোগ সন্ধানীদের কারণে ভিটে বাড়িসহ জমিজমা খোয়া যায়। ছোটো ছোটো সাত ছেলেমেয়ে নিয়ে দারিদ্র্য ও অসহায়ভাবে জীবন কাটাতে কাটাতে বর্তমান অবস্থায় তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন।

তার বাকি জীবন একটু আরামে কাটাতে হলে তিনি মনে করেন কামালনগরের আশে পাশে এক খণ্ড জমি ও একটি ঘর তার দরকার। জোলেখা কামালনগর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চান না। কারণ তিনি এ এলাকার লোকজনের পরিচিত বলে দু'মুঠো ভিক্ষা পাচ্ছেন। সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, জোলেখা খাতুন দেশ স্বাধীনের পূর্ব থেকে সাতক্ষীরার কামাল নগরে বসবাস করছেন। সে কারণেই তিনি কামাল নগর ছেড়ে অন্য কোনো জায়গায় বসবাস করতে চান না। এ এলাকার অনেকেই তাকে চেনেন ও তার সম্পর্কে জানেন, এ কারণে তাকে অনেকেই দয়া করে চাল, ডাল দেন, খুচরা টাকা পয়সা দান করেন। তাছাড়া কামাল নগরে বসবাস করে তিনি অনেকের কাছ থেকে প্রায়ই সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। জোলেখার আশঙ্কা অন্য কোনো স্থানে তাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিলে তিনি সারা বছর খাবার জোগাড় করতে পারবেন না। বর্তমানে খেয়ে না খেয়ে থাকলেও অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করলে তাকে কেউ টাকা-পয়সা বা চাল ডাল দিয়ে সাহায্য করবে না।

এসব দিক বিবেচনা করে জোলেখা বলেন, কামাল নগর, তালতলা বা শহরের আশেপাশে তাকে এক খন্ড জমি কিনে দিলে তিনি ওই জমিতে ঘর তুলে পরিচিতদের কাছ থেকে চেয়ে খেতে পারবেন। তাকে অন্তত বাসস্থানের চিন্তা করতে হবে না। উচ্ছেদ হবারও ভয় থাকবে না।

সাতক্ষীরা শহরে ও শহরতলীতে জমির দাম কাঠা প্রতি ৬০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা। থানা পর্যায়ে অর্থাৎ আশাশুনি ও কালিগঞ্জে জমির দাম কাঠা প্রতি ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা। যে জমিতে যত বাণিজ্যিক সুবিধা আছে সেই জমির দাম তত বেশি। থানা পর্যায়ে ধানি জমির দাম কাঠা প্রতি ১৫ হাজার টাকা। জোলেখা খাতুনের অন্য কোনো ব্যবসা বা দোকান করা সম্ভব না। কারণ ব্যবসা চালানোর শারীরিক ও মানসিক সমর্থ তার নেই। লোকবলেরও অভাব বয়েছে। ছেলেরাও কেউ তাকে সাহায্য করতে পারবে না।

জোলেখা খাতুনকে যতদূর সম্ভব শহরের কাছাকাছি বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলে তিনি খুশি হবেন বলে জানান।

নাম: রোকেয়া বেগম

বয়স: ৪৭

বর্তমান ঠিকানা: মালঞ্চি, নারকেলবাড়িয়া, বাঘারপাড়া যশোর।

যশোর নড়াইল রোড ধরে বিশ কিলোমিটার যাওয়ার পর বাঘারপাড়া থানা। বাঘারপাড়া থেকে কিছুদূর পাকা রাস্তা পার হয়ে মেঠো পথ ধরে আট কিঃ মিঃ যাওয়ার পর মালঞ্চি গ্রাম। সাধারণত ভ্যানে বা পায়ে হেঁটে এই পথ পাড়ি দিতে হয়। এই মালঞ্চি গ্রামে রোকেয়া তার স্বামীর সাথে বসবাস করছেন। দেশ স্বাধীনের পর রোকেয়া বেগমের বিয়ে হয় মোঃ ওহেদ আলীর (৬০) সাথে। তাদের দু'টি মেয়ে। বড় মেয়ে রাশিদা খাতুন (১৯) এসএসসি পাস।

তার বিয়ে হয়ে গেছে। বর্তমানে স্বামী, স্ত্রী ও ছোট মেয়ে নাজমা খাতুন (১৬/১৭) এক সাথে থাকেন। নাজমা ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী।

রোকেয়া বেগম বাবার বাড়ি থেকে ৬ শতক জমি পেয়েছিলেন। ঐ জমি বর্গা দিয়ে বছরে যে ধান ও শাক-সব্জি পান তাই দিয়ে রোকেয়ার তিন জনের সংসার টানাটানির মধ্যে চলে যায়। স্বামী অসুস্থ বলে চাষাবাদ করতে পারেন না। অন্য কোনো কাজও করতে পারেন না। রোকেয়ার স্বামী পৈতৃক সূত্রে ৩ শতক জমি পেয়েছেন। কিন্তু তা থেকে কোনো আয় নেই। কারণ ঐ জমি নিয়ে শরিকদের সাথে বিরোধ রয়েছে। তারপরও যদি চাল বা তরিতরকারির টানাটানি হয় তাহলে শরিক বা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে সাহায্য পান। নদী বা বিল থেকে রোকেয়ার স্বামী মাঝে মাঝে মাছ ধরেন যা দিয়ে দু'একদিনের রান্না চলে।

রোকেয়া ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও প্রশিকা থেকে ৫০ হাজার টাকার মত সাহায্য পেয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এবং ভিটে মাটিতে একটি টিনের ঘর তুলেছেন। সেই ঘরে তাদের তিনজনের থাকতে কোনো অসুবিধা হয় না।

রোকেয়া বেগম বলেন বর্তমানে তার ছোট মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। বিয়ে দিতে ৫০-৬০ হাজার টাকার দরকার। মেয়েকে ভালো ঘরে বিয়ে দিতে পারলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তাছাড়া তিনি যদি কোনো সাহায্য পান তাহলে স্বামীকে বাঘারপাড়া থানা শহরে দোকান করে দেবেন। তার স্বামী মৌসুমি ধান কিনে পরে বেশি দামে বিক্রি করতে আগ্রহী। বাঘারপাড়ায় দোকান নিতে ৫০ হাজার টাকার মতো দরকার হবে।

রোকেয়ার স্বামী ওহেদ আলী বলেন, ৫০ হাজার টাকা হলে বাঘারপাড়ায় ২বিঘা জমি বন্ধক পাওয়া যায়। এই জমি চাষ করে দু'বছরে দ্বিগুণ লাভ করা যায়। তবে এর জন্য দরকার লোকবল ও নিজের পরিশ্রম। তা না হলে লোকশানও হতে পারে।

রোকেয়া বলেন, সব থেকে ভালো হবে বাঘারপাড়ায় কিছু জমি কিনতে পারলে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় বাঘার পাড়ায় ৫০- ৬০ হাজার টাকায় ১০ কাঠা জমি পাওয়া যায়। প্রতি বছর দু'বারে ২০ থেকে ২৫ মণ ধান সে জমি থেকে পাওয়া যাবে। ২০ মণ নতুন ধানের দাম কমপক্ষে ৬ হাজার টাকা। চাষাবাদের জন্য খরচ ২ হাজার টাকা বাদ দিলে বছরে কমপক্ষে ৪ হাজার টাকা মুনাফা থাকে।

রোকেয়া বলেন, "আমার স্বামীর বয়স হয়েছে। স্বামীর বিচার বুদ্ধিও তেমন ভালো না। আমিও ব্যবসা বাণিজ্য তেমন বুঝি না। আমার ছয় শতক জমি আছে। আরো যদি কিছু জমি করতে পারি তাহলে সংসার আর একটু স্বচ্ছল হবে। তাছাড়া জমি হাত ছাড়া হবার ভয় নেই বললেই চলে।"

নাম: ফাতেমা খাতুন
বয়স: ৫১
বর্তমান ঠিকানা: ইন্দ্রা, বাঘারপাড়া, যশোর।

যশোর জেলার বাঘারপাড়া থানা থেকে প্রায় ৬ কি:মি দূরে ইন্দ্রা গ্রামের গুচ্ছ গ্রাম। সরকারি তত্ত্বাবধায়নে এই গুচ্ছ গ্রামে ফাতেমা জমি পেয়েছে। বর্তমানে এই গুচ্ছ গ্রামেই ফাতেমা খাতুন ঘর তুলে বসবাস করছেন। ফাতেমা বাড়ির পাশেই ছোট একটি মুদি দোকান দিয়েছেন। দোকানটি টিনের তৈরি। চিড়া, মুড়ি, মোয়া, চকলেট, আচার বেশি বিক্রি হয়। পেয়াজ, রসুন, ডালসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও বিক্রি হয়। ফাতেমা নিজেই এই দোকান চালান। নিজে বাঘারপাড়া পাইকারি দোকান থেকে মালামাল কিনে আনেন। নিজেই দোকানে বসে বিক্রি করেন। তবে মেজ ছেলেও মাঝে মাঝে দোকানে বসে। ফাতেমা জানান, প্রতি মাসে এই দোকান থেকে বারো থেকে পনেরোশ' টাকা আয় হয়। এ টাকা দিয়ে তার সংসার চলে। ফাতেমার দু'বার বিয়ে হলেও বর্তমানে কোনো স্বামীই তাকে দেখে না। তাকে নিজের আয়ে চলতে হয়। দু'স্বামীর মোট তিন ছেলে। বড় ছেলে মিজানুর রহমান (২৭) ট্রাকের হেলপার। মিজান মায়ের কাছে বউ ও এক সন্তান রেখে শহরে শহরে ট্রাক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসলেও টাকাপয়সা দিয়ে সংসারে সাহায্য করতে পারে না। মেজ ছেলে ফকরুল হাসান (১৭)

৫ম শ্রেণীতে পড়ে। পড়ালেখার পাশাপাশি ভ্যান চালিয়ে মাকে পাঁচ ছয়শ’ টাকা দেয়। কয়েক বছর আগে ফাতেমার জমানো দুই হাজার টাকা দিয়ে এই ভ্যানটি কিনেছিলেন। সংসারের জন্য ফকরুলের বেশ কষ্ট করতে হয়। নিজের পড়া লেখা আছে, দোকানে বসতে হয়, আবার বাড়তি আয়ের জন্য ভ্যান চালাতে হয়। ছোট ছেলে আবু বকর সিদ্দক ৩য় শ্রেণীর ছাত্র। সে এখনও সংসারে তেমন কোনো সাহায্য করতে পারে না।
স্বাধীনের সময় ও পরে অনেক অপমান যন্ত্রণা সহ্য করে ফাতেমাকে বাঁচতে হয়েছে। বর্তমানে, শেষ বয়সে সম্মানের সাথে বাঁচতে হলে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা দরকার বলে ফাতেমা জানান। ফাতেমার শরীরও তেমন ভালো না। আমরা যেদিন ফাতেমার সাক্ষাৎকার নেই, সেদিন গায়ে জ্বর নিয়ে তিনি বাঘারপাড়া গিয়েছিলেন দোকানের মালামাল কিনতে। দোকানের মালামাল না কিনলে দোকান যেমন চলবে না তেমন সংসারও চলবে না।
কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যদি তাকে সাহায্য করে তবে তিনি দোকানটি বড় করে বেশি মালামাল তুলবেন বলে আমাদের জানান। তাতে বর্তমানের থেকে আরো ভালোভাবে দোকান চালানো সম্ভব হবে। মুনাফা বেশি হবে বলে তিনি জানান।অথবা তিনি ১০ থেকে ১৫ কাঠা জমি কিনে মেজ ছেলের তত্ত্বাবধায়নে চাষাবাদ করাতে চান। এতে করে বছরে তার ছয় সাত হাজার টাকা আয় হবে বলে তিনি আশা করেন।

শিক্ষিত কারো মতামত নিয়ে তিনি কিছু টাকা ব্যাংকে রাখতেও আগ্রহ প্রকাশ করেন। যাতে অসুখ-বিসুখ হলে বা কোনো বিপদে পড়লে খরচ করতে পারেন। বর্তমানে তার নিজের শরীরও ভালো না। মাঝে মাঝে জ্বর হয়। আগের থেকে অনেক ওজন কমে গেছে। কখন কি বিপদ হয় বলা যায় না ভেবে ফাতেমা কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে চান।

নাম: হালিমা পারভীন
বয়স:৪৭
বর্তমান ঠিকানা: মুরালি খাঁ পাড়া, রাজারহাট, যশোর।

যশোর জেলার বাঘারপাড়া থানার ইন্দ্রা গ্রামের মেয়ে হালিমা পারভীন। হালিমা ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া লেখা করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আতিয়ার রহমানের (৪৯) সাথে হালিমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি যশোরে চলে আসেন। বর্তমানে যশোরের মুরালি খাঁ পাড়ায় দেবরের বাড়িতে হালিমা স্বামীসন্তান নিয়ে সাথে বসবাস করছেন। তাদের এক মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়ে লুবনা সুলতানাকে (২২) এসএসসি পাসের পর বিয়ে দেয়া হয়েছে। মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে থাকে। ছেলে নাজমুল আলম লিপু ৮ম শ্রেণীর ছাত্র।
নাজমুলের চোখে সমস্যা। তার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। ইতোমধ্যে হালিমা ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি থেকে ২০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। সেই টাকা নিজের ও মেয়ের চিকিৎসায় শেষ হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় হালিমা যশোর টিবি হাসপাতালে আয়ার চাকরি করেন। মাত্র ২৪ শ’ টাকা বেতন পান। প্রতি মাসে ছেলের চিকিৎসা আর পড়ালেখার খরচ চালাতেই বেতনের অর্ধেক শেষ হয়ে যায়। এরপর সারা মাস সংসারের খাওয়া ও অন্যান্য খরচ টানাটানির মধ্যে চালাতে হয়।
হালিমার স্বামী এসএসসি পাশ। আগে তিনি রাখি মালের (ধান, পেয়াজ, আলু, ছোলা ইত্যাদি ক্রয় করে পরে দাম বাড়লে বিক্রি করা) ব্যবসা করতেন। ব্যবসায় লোকশানের জন্য আতিয়ার ব্যবসা ছেড়ে দেন। বর্তমানে তিনি বেকার। হালিমার সহায়তায় আতিয়ার এক বছরের (এলএমএএফপি এন্ড জি)পল্লী চিকিৎসকের কোর্স করেছিলেন। মাঝে মাঝে প্রতিবেশীর ওষুধের দোকানে বসেন। তবে সেখান থেকে কোনো টাকাপয়সা পান না। মাঝে মাঝে কোনো রোগী খুশি হয়ে পাঁচ দশ টাকা দিলে সেই টাকা দিয়ে আতিয়ার নিজের পকেট খরচ চালান। প্রায় পনেরো বছর আতিয়ার সংসারে কোনো সাহায্য করতে পারেননি।
হালিমার ইচ্ছা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি তাকে সাহায্য করে তবে প্রথমে তার স্বামীকে একটি ওষুধের দোকান করে দেবেন। হালিমার ধারণা, যেহেতু তার স্বামী মাঝে মাঝে ওষুধের দোকানে বসে একারণে সে

ওষুধের দোকান চালাতে পারবে। সরেজমিন খোঁজ নিয়ে দেখা যায় মুরালি মোড় বা হাসপাতালের সামনে একটি ওষুধের দোকানের পজিশন নিতে ৭০ থেকে ৭৫ হাজার টাকা খরচ হবে। স্বামী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে ওষুধের দোকান চালাতে অসুবিধা না হলেও দোকানে ওষুধ তুলতে আরো ৫০ হাজার টাকার দরকার হবে। তাছাড়া হালিমা যেহেতু হাসপাতালে চাকরি করেন, তাই তিনি বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে বাকি ওষুধ নিয়ে বিক্রি করে ওষুধের টাকা শোধ করতে পারবেন বলে জানান। এলাকার অন্যান্য ওষুধের দোকান মালিকদের সাথে আতিয়ার কথা বলে জেনেছেন, ওষুধের দোকান খুব একটা লাভজনক না হলেও ভালোভাবে পরিশ্রম করলে সংসার চালানোর খরচ উঠে আসবে। দোকানে ঠিকমতো মালামাল তুলতে পারলে সব খরচ বাদে মাসে তিন হাজার টাকার মতো লাভ থাকবে।

আতিয়ার আগে রাখি মালের ব্যবসা করতেন। কম দামে চাল কিনে ঘরে রেখে কয়েক মাস পরে বিক্রি করলে বছরে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় হয়। এই প্রাক্তন ব্যবসায় আতিয়ারের আগ্রহ থাকলেও বাজার ঘুরে দেখা গেছে এ ব্যবসায় ঝুঁকি বেশি। পুঁজি নষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আগেও একবার তার পুঁজি নষ্ট হয়েছে। তারপরও আতিয়ারের এই ব্যবসায় আগ্রহ থাকলেও হালিমার তেমন আগ্রহ নেই।

হালিমা কোনো পুঁজি পেলে তা নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে রাজি নন। হালিমা পারভীন বলেন, ৫০ বা ৬০ হাজার টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখলে মাসে মাসে ছেলের পড়ালেখার খরচটা পেতে পারেন। তাছাড়া ১৮ বছর বয়সে ছেলের মেজর একটা অপারেশন করতে হবে। সে সময় অনেক টাকা দরকার হবে। এখন থেকে সে টাকা না জমালে অপারেশন করানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। নিজেদের কোনো টাকা-পয়সা জমানো সম্ভব হয়নি।

পরিবারের অমতে বিয়ে করার অপরাধে আতিয়ার পৈত্রিক কোনো সম্পত্তি পাননি। এজন্য আর্থিকভাবে তাদের সহযোগিতা করার মতো কোনো উৎস তাদের নেই। হালিমা দুঃখের সাথে জানান, ‘এতো দিন নিজের রক্তপানি করে যা আয় করেছি, তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চালিয়ে নিয়েছি। কিন্ত ছেলে বড় হচ্ছে। পড়ালেখার খরচ বাড়ছে। স্বামীর কোনো আয় নেই। ভবিষ্যতে কিভাবে সংসার চলবে আল্লাই জানেন।’

এসএএম হুসাইন শাহীন
প্রকল্প সমন্বয়কারী
ফোন:০১৭১ ১৪ ৩৭ ৯৪
E-mail: husain_war@yahoo.com